মূল্যায়ন

বালুরঘাট সংস্কৃতির শহর। নাচ, গান, শিক্ষা, সাহিত্য সবেতেই বালুরঘাটের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এই সব ছাপিয়ে নাটক অন্য এক উচ্চতায় নিয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের নাট্যমানচিত্রে কলকাতার সঙ্গে যে দু-একটি শহরের নাম উচ্চারিত হয় বালুরঘাট তার মধ্যে অন্যতম। বহু গুণীজনের আত্মত্যাগ, নাটকের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা মঞ্চ ও মঞ্চের বাইরে যাঁরা প্রতিনিয়ত থিয়েটারের জন্য কাজ করে চলেছেন তাঁদের সম্মিলিত প্রয়াস এই স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। বাংলা নাটকের ইতিহাসে দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট শহরকে বাদ দিলে হবে না। ড. মন্মথ রায় থেকে শুরু করে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় হয়ে বর্তমান প্রজন্ম যারা আজও নাটক করছেন, নাটক নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছেন, তাঁরা এই প্রবাহটাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

সমগ্র দিনাজপুর অঞ্চলের খন্ডিত ও ক্ষুদ্র অংশ হওয়া সত্ত্বেও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি বৈচিত্র্যময় ও গৌরবোজ্জ্বল। এই জেলার মাটির নিচে লুকিয়ে আছে কত সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস, সংস্কৃতির বিবর্তনের নানা ধাপ। স্বাধীনতা লাভের পরেও সেই ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা সেভাবে হয়নি। এই জেলার মাটিতে বিদেশী শক্তি আক্রমণ ঘটেছে বারবার কেউ চলে গেছে, কেউ স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছে। জৈন, হিন্দু, মুসলিম, খ্রীষ্টান-সব ধর্ম ও সংস্কৃতির মহামিলন এই জেলা। নানা জাতির স্রোতধারার মিলনে সমৃদ্ধ ও বিচিত্র, সংস্কৃতিও তাই নানা ধারা-উপধারার মিলনে-মিশ্রণে এক চমকপ্রদ রসের প্রবাহ বইয়ে দিয়েছে।

ছয়ের দশকের শেষ থেকে সাতের দশক বালুরঘাটের নাটকের স্বর্ণযুগ। একদিকে বালুরঘাটের নাট্যমন্দির অন্যদিকে 'ত্রিতীর্থ'। দুটি সংস্থাই একের পর এক নাটক পরিবেশন করেছে। দুটি নাটক হলেই প্রচুর দর্শক। শহর জুড়ে চলত নাটকের আলোচনা। ত্রিতীর্থের 'ভাঙ্গাপট', 'দেবীগর্জন', 'তিনবিজ্ঞানী', 'দেবাংশী', 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র', প্রভৃতি নাটক যেমন বালুরঘাটের নাট্য মোদী দর্শককে গভীর ভাবে আকর্ষণ করেছে তেমনি নাট্যমন্দিরে 'কালো মাটির কান্না', 'ফেরা', 'গণদেবতা', 'ছেঁড়াতার', 'তাহার নামটি রঞ্জনা', 'নীলদর্পন', 'সাজানো বাগান', 'ঝুমুর', দানসাগর', 'গুলশন', ইত্যাদি নাটক নাট্যপ্রেমীদের মুগ্ধ করেছে। এই সমবেত নাট্যজোয়ার বালুরঘাটকে নাটকের শহর বানিয়েছিল। সেই সঙ্গে কলকাতার নাট্য সমাজেও বালুরঘাট স্থান করে নিয়েছিল।

১৯৭০-১৯৮০ দশকে আবার বেশ কিছু নাট্য সংস্থার জন্ম হয়। অভিযাত্রী, লোকায়ন, তূণীর, সংকেত। ১৯৮২ তে জন্ম হয় 'ভারতীয় গণনাট্যের বালুরঘাটের শাখা'। মূলত বামপন্থী আদর্শ থেকে এই দলগুলি জন্ম নেয়। দলগত ভাবে এদের বিশ্বাস বামপন্থী আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছে। ১৯৮২ তে সৃষ্টি নাট্যতীর্থও বেশ কিছু ভালো নাটক উপহার দিয়েছে (দানসাগর, সাজানো বাগান, ড: ফস্টাস, কানামামা) এবং নাটক নিয়ে বেশ কিছু কর্মসূচীও গ্রহণ করেছে। ধীরে ধীরে নাট্যতীর্থ ও পশ্চিমবঙ্গের নাট্যমোদী জনগণের প্রশংসা অর্জন করে বালুরঘাটের নাট্যচর্চার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। গত শতাব্দী জুড়েই বিশেষ করে

স্বাধীনতার উত্তর কালে বালুরঘাটের নাটক নিয়ে উন্মাদনা চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছেছিল। এই ছোট মফ:স্বল শহরে এতগুলি দল নাটক করত, প্রচুর দর্শক হত, চায়ের দোকানে আড্ডায় নাটকের আলোচনা হত, হত তর্ক, হত চুলচেরা বিশ্লেষণ - এই সমস্ত বালুরঘাটের নাট্য দর্শক ও নাট্যকর্মীদের (প্রবীন) মুখ থেকে শোনা। একশো বছর পূর্ব থেকে হয়ত বা তাঁরও পূর্ব থেকে বালুরঘাটের জনগণ নাটকের প্রতি ভীষণ ভাবে চুম্বকের মতো আকর্ষিত ছিল। বর্তমানে সেই ধারাই রয়েছে। বালুরঘাটবাসীকে নাট্যোম্মদনা বৃদ্ধি করেছে স্থানীয় নাট্য সংস্থা (গ্রুপ থিয়েটার) গুলি। কেবল বালুরঘাটে নয়- বালুরঘাট নাট্যমন্দির, ত্রিতীর্থ, নাট্যতীর্থ, নাট্যকর্মী, সমবেত নাট্যকর্মী বালুরঘাটের বাইরে, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যখন নাটক প্রদর্শন করতে গিয়েছেন দারুণ প্রশংসিত হয়েছে। লক্ষ্মৌ, পাটনা, কলকাতা উত্তরবঙ্গের সব জেলাতে নাট্য সংস্থা তাদের মধ্যে অসামান্য কৃতিত্ব বজায় রেখেছে। ত্রিতীর্থ পূর্বে উল্লেখিত স্থানতো বটেই, তাছাড়া দিল্লি, অসম গিয়েছে। নাট্যকর্মী তাদের নাটক নিয়ে মুম্বাই পর্যন্ত গিয়েছে। সমবেত নাট্যকর্মী কলকাতা ও শিলিগুড়িতে বহুল প্রশংসিত। বিভিন্ন সংস্থার নির্বাচিত নাটকগুলি নাট্যগুণ সমন্বিত। বালুরঘাটের বাইরে থেকে কোনো নাট্যামোদী ব্যক্তি আসলে ত্রিতীর্থ কিংবা বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের নাটক অবশ্যই দেখতেন।

একুশ শতক দ্রুততার সঙ্গে সমস্ত কিছু পালটে দিচ্ছে, পরিবর্তন ঘটছে সময়ের, অর্কুট, ফেসবুক, টুইটার, ব্লগের মতো সোশ্যাল সাইটগুলি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের চিন্তা চেতনার পরিবর্তন ঘটছে। একই সঙ্গে নাটক, সিনেমা, সাহিত্য জগতেও পরিবর্তন ঘটছে। এর সঙ্গে রয়েছে কঠিন অর্থ নৈতিক অবস্থা, বেসরকারীকরণ, ভোগবাদী ব্যবস্থা মানুষের চিন্তা মনন সমস্ত কিছু দখলদারী নিয়েছে। বিশেষ করে আমাদের মত মফঃস্বল শহল গুলিতে যেন আরও প্রবল। টিভির বানিজ্য চ্যানেল গুলি আমাদের সংস্কৃতিকে প্রমোট করেছে যার সঙ্গে হয়ত আমাদের নাটক পেরে উঠছে না। তবে একথা অস্বীকার করা যায় না যে ভাল নাটক করতে পারলে টি.ভি. ইন্টারনেট কোনো বাধা নয়। বালুরঘাটের মাটিতে এটা প্রমাণিত যে শনিবার/ রবিবার নাটক হলে প্রচুর দর্শক হয় শুধু তাই নয় বাইরের দল বিশেষ করে কলকাতার দল আসলে হলের টিকিট পাওয়া যায় না। এটাই বালুরঘাটের গর্ব। বর্তমানে কনটেন্ট যে ভাবে ব্যপ্তিলাভ করছে সেই ধরণের নাটকের চিন্তাধারা না হলে যে কোন সংস্থাই পিছিয়ে যাবে। গ্রামে গ্রামে ঘুরে বা গ্রাম জীবনের অভিজ্ঞতা যদি নাটকের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা যায় তা হলে দর্শক নাট্য বিমুখ হবে না। বালুরঘাটের মানুষ নাটক চায় তাদের এই ইচ্ছা পূরণ করার জন্য নাট্যদল গুলির সক্রিয় হওয়া আরো বেশী দরকার। একথাও ঠিক বিশেষ করে বালুরঘাটের গ্রুপ থিয়েটার সম্পর্কে একটি নেতিবাচক আলোচনা সকলের মুখে-কিন্তু কলকাতায় কী, আর জেলায় কী ভালো থিয়েটার কি হচ্ছে না? প্রধান পরিচালক থেকে শুরু করে যাঁরা নাটকের সঙ্গে জড়িত তাঁরা প্রত্যেকেই বহু অসুবিধার মধ্যেই ভালো কাজ করছেন। কিন্তু থিয়েটারের সাম্প্রতিক প্রবণতা যতটা খারাপ তার থেকেও বেশি বাড়িয়ে বলা হচ্ছে। তুলনায় ভালো কাজ হলেও ততটা ভালো বলা হচ্ছে না-এই মানস গঠন নাটকের ক্ষতি করছে।

সমস্ত গ্রুপথিয়েটারের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল তাঁরা বড্ড আত্মকেন্দ্রিক। নিজের সংস্থার অভিনেতা- অভিনেত্রীদের (যাঁদের তাঁরা তৈরী করেন) অন্য কোথায় অভিনয় করার সুযোগ থাকে না। নাটকের উন্নতি কল্পে প্রতিটি সংস্থা কাঁধে কাঁধ রেখে কাজ করে না। কোনো

সংস্থার যদি উপযুক্ত অভিনেতার অভাব থাকে, কিন্তু অন্য সংস্থায় থাকলেও অর্থের বিনিময়েও তাঁকে পাওয়া যায় না। কারণ যে শিল্পী যে সংস্থায় অভিনয় করেন তিনি সেখানকার সম্পদ হয়ে যান। কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের সবকটি জেলার ছোট বড় নানান ধরনের গোষ্ঠীর সংখ্যা কমবেশী ৩০০০ (তিন হাজার) এর মত। এই সমস্ত দলের আয়তন বা গুণমান যাই হোক না কেন, গড় মানসিকতা মোটামুটি একই ধরনের। এরা মুখে আদর্শ অথবা জঙ্গীপনা দেখালেও বাস্তবে কিন্তু তোষামত, গ্ল্যামার ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থে আগ্রহী। শহরে বা মফঃস্বলের সর্বত্র থিয়েটাররের দলগুলির পরস্পরের প্রতি অসূয়াজনিত বিরোধীতার কথা সর্বজনবিদিত। কারো কারো কাছে থিয়েটার আজ আর সামাজিক দায় নয়। রজত পট কিংবা ছোট পর্দার শিল্পী নির্দেশক কলাকুশলী নির্বাচনের সোপান মাত্র। মফঃস্বলের মঞ্চগুলি নানা ধরনের বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে অভিনয় চালিয়ে যায়। যেমন উপযুক্ত সরঞ্জাম, আধুনিক যন্ত্রপাতি, নিজস্ব মঞ্চ, উপযুক্ত অভিনেত্রী ইত্যাদির অভাব।থিয়েটার পরিচালনার ক্ষেত্রে অর্থের একটি অপরিহার্য ভূমিকা থাকে। একটা সাধারণ নাটক মঞ্চস্থ করতে যাঁদের মঞ্চ নেই তাঁদের কমকরে দশ-পনের হাজার টাকার প্রয়োজন এই প্রয়োজনীয় টাকা টিকিট বিক্রি করা বা অনুদানের মাধ্যমে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। কোনো সংস্থার অর্থনীতি আসলে দু'রকম-প্রথমটি দলের অর্থনীতি, দ্বিতীয়টি দলের সদস্যদের ব্যক্তিগত অর্থনীতি। দলের অর্থনীতি তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল-

১. সরকার গ্রান্ট বা অনুদান
২. বেসরকারী বহুজাতিক বা স্থানীয় ব্যবসায়ী সংস্থার স্পনসরশিপ
৩. কল শো করে ব্যয় বাদ দিয়ে সংস্থার উপার্জিত অর্থ।

সরকারী অনুদান দু'রকম -

১)কেন্দ্র সরকারের দেওয়া অনুদান
২) রাজ্য সরকারের দেওয়া অনুদান।

কেন্দ্রীয় সরকার একটি দলকে দ'ধরণের অনুদান দেয়-

১.প্রোডাকশন গ্রান্ট
২. সেলারী গ্রান্ট (অভিনেতা ও নির্দেশকের মাসিক অনুদান)।

প্রোডাকশন বা স্যালারি গ্রান্ট বা রাজ্য সরকারের অনুদান কোনো কোনো সংস্থা পায় তবুও সম্পূর্ণ পায় না। তাই দেখা যায় বর্তমানে থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হওয়া ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক অবস্থা অতীব করুণ।বেকার ছেলেমেয়েরা কি ভাবে অভিনয় পেশায় যাবে? কলকাতায়,মফঃস্থলে ও গ্রামে হাজার হাজার নতুন থিয়েটারের ছেলে মেয়েরা আছেন,তাঁরা সত্যিই কীভাবে জীবিকা অর্জন করবেন তা ভাবতে গেলে শিউরে উঠতে হয়।

যত অসুবিধাই থাক না কেন দর্শকদের হল মুখি করতে না পারা বর্তমান নাট্যকর্মীদের ব্যর্থতা। জনমঙ্গলের জন্য সমাজভাবনায় নাটকের শুরু হয়েছিল চার-এর দশকে। সে যুগের সমাজ আন্দোলন আর নাট্য আন্দোলন পরস্পরের অঙ্গ ছিল। নেতা আর অভিনেতাদের ভাবনা এবং কাজে কোন রকম ফাঁকি ছিল না। নাট্যমঞ্চও থাকত দর্শকে ভরপুর। কিন্তু বর্তমানে আমরা সেই রূপ দেখতে পাই না। সামাজিক দায়বদ্ধতা সুস্থ সংস্কৃতির জন্য নতুন ধারার সংস্কৃতি প্রয়োজন যা মানুষের ভাবাবেগকে আলোড়িত করবে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা গুলোর সঙ্গে একাত্ম হতে পারবে। বাবুদের জন্য বালুরঘাটের নাট্যদল। মানুষ বলতে

বাবু মানুষ নয়। নাটক তো কখনো শ্রমিকের বস্তি, কৃষকের কাছে যায়নি। বিভিন্ন সংস্থা শহরের গন্ডীতে বসে অনেক ক্ষেত্রে চর্বিত চর্বন করেছে। নাটকের লোকের আদর্শ বোঝা বড় কঠিন। নাটকের মঞ্চে মানুষের জীবন যন্ত্রণাকে, মানুষের নিজস্ব সংস্কৃতিকে যাকে এলিট সমাজ আজও ছুঁতে পারছে না। মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার প্রকাশ করার জন্যই নাটক। সংস্কৃতি তো জীবনের কথা বলে। সংস্কৃতি সহনশীলতার, জন্ম দেয়। মানুষের মনের ভাষা তার শিল্পকার্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাবে। সংস্কৃতি হল আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন। কিন্তু এই সংস্কৃতির আদান প্রদান দেখা যায় না বালুরঘাটের গ্রুপ থিয়েটরের ক্ষেত্রে। বালুরঘাটের নাট্যদল গুলি গ্রাম গঞ্জে নিজেকে প্রসারিত করে দেয় না। যদিও গ্রামে অভিনয়ের ক্ষেত্রে বাধা আছে। গ্রামের জীবনযাত্রা, চাষবাস, রাজনীতি, তাদের সংস্কৃতি, মানসিক প্রবণতা সম্বন্ধে নাট্যকর্মীরা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নন। গ্রামের মানুষের রুচি সম্বন্ধে ধারণা না থাকায় নাটক উপস্থাপনা ওঁদের ভালো নাও লাগতে পারে। নাটকের দ্বন্দ্ব, গল্প এবং চরিত্র যদি গ্রামের মানুষের কাছে বিশ্বাস যোগ্য না হয় তাহলে অসুবিধা আছে। বিষয়টি গ্রামের মানুষের কাছাকাছি হওয়া চাই। তাই গ্রামে অভিনয় করার ক্ষেত্রে প্রথমে তাঁদের মানসিক যোগাযোগ প্রয়োজন। তবে এটা সত্য যে, যে জীবন ওঁরা দেখতে অভ্যস্ত নন তাও ওঁদের ভালো লাগতে পারে যদি তার উপস্থাপনা ভালো হয়। যখন কোন থিয়েটারের মাধ্যমে সুস্থ জীবন চেতনা উন্মেষ হয় তখন তার অন্তলীন প্রচার গৌণ হয়ে দাঁড়ায়। যদি কোন থিয়েটার মানুষের মর্মমূলে নাড়া দিয়ে নতুন করে নিজেকে চিনতে, আবিষ্কার করতে, প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে তবেই তা সার্থক।

গ্রুপ থিয়েটার গণনাট্যের উপর জিতে গেছে। তার কারণ গ্রুপ থিয়েটারে যাঁরা অংশ নিয়েছে তাঁদের অনেকেই চূড়ান্ত শ্রম,নিষ্ঠা ও কল্পনার একটা সামঞ্জস্য আয়ত্ব করার প্রয়াস পেয়েছে। কোথাও তাড়াহুড়ো করেননি। কোথাও ফাঁকি দেননি। ত্রুটিহীন তাঁদের সব প্রযোজনা সার্থক হয়েছে, বাংলা মঞ্চে ইতিহাস তৈরি করেছে। তবে যে আদর্শ, আশা-প্রতাশা নিয়ে গ্রুপ থিয়েটারের যাত্রা শুরু হয়েছিল, গণনাট্য থেকে বেড়িয়ে এসেছিল নবনাট্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল গ্রুপ থিয়েটারের সেই আন্দোলন আজ স্থিমিত। গ্রুপ থিয়েটার যে হঠাৎ করে দুর্বল হয়ে পড়েছে তা নয়। নিত্যদিনের জীবন যাত্রায় যে মানুষের দায়বদ্ধতা বেড়ে চলেছে তার ফলেই সাধারণ মানুষ থিয়েটারের ক্ষেত্রে মন সংযোগ খাটো করেছে। খুব ভালো নাটক না হলে দর্শক হলমুখি হতে চায় না- এই চিত্র পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র। বালুরঘাটও তার থেকে আলাদা নয়। বাংলা নাটক এখন প্রয়োগরীতিতে বেশ পরিপক্ক হয়ে উঠলেও কাহিনিতে নতুনত্ব তেমন নেই। নাটক মৌলিক বা অনুবাদ বা রূপান্তর যাই হোক না কেন তা যদি দর্শক আনতে সমর্থ হয়, যদি দল নিজেকে টিকিয়ে রাখার মত ভূমিটুকু পায় তা হলে সেই নাটক মঞ্চস্থ করতে তো কোনো ক্ষতি নেই। তাই নাটক নির্বাচন এমন হওয়া উচিৎ তা যেন সুন্দর ও সৎ হয়। তা সে দেশী বা বিদেশী যে নাটকই হোক না কেন। সেই সঙ্গে নাট্যদল গুলিকেও সৎ থাকতে হবে। যে উদ্দেশ্য আদর্শ বোধ নিয়ে নাট্যদল গুলি সৃষ্টি তা থেকে বিচ্যুত হলে চলবে না। নাটক এমন একটি শিল্প যা কেবল দর্শকের জন্য। দর্শকই নাটকের ভাগ্য নিয়ন্তা, বিচারক। ফলে নাটক নির্বাচনের ক্ষেত্রে দর্শকের কথা ভুললে চলবে না। দর্শকের মানসিকতা, চাহিদা ইচ্ছা-অনিচ্ছার গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

বালুরঘাটে বেশ কতকগুলি সংস্থা রয়েছে কিন্তু সেই পরিমান নাটককার নেই। সংস্থার

নিজস্ব নাটককার না থাকলেও নিয়মিত নাটক পরিবেশনে অসুবিধা হয়। বালুরঘাটে মোট ৮-১০জন নাটককার রয়েছেন। ত্রিতীর্থের হরিমাধব মুখোপাধ্যায় ৪০টি নাটক লিখেছেন অন্যান্য নাটককারেরাও বেশ কতকগুলি নাটক লিখেছেন। এই অল্প সংখ্যক নাটকে বালুরঘাটের দর্শকের মন উঠে না। নাটককারেরা জীবনমুখি যে কোনো বক্তব্য তা শ্রমিক হোক, কৃষক হোক, মধ্যবিত্ত বা ধনী হোক-সকলের জীবনকে মানবিক চেতনাকে সমৃদ্ধ করে তোলে এমন বিষয় নিয়ে নাটক লিখতেই পারেন। শুধু এইটি লক্ষ্য রাখতে হবে যে দর্শকের মাথার উপর দিয়ে তা যেন চলে না যায়। দর্শকের তা যেন আকৃষ্ট করে, আলোকিত আর উদ্দীপিত করে।এত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও বালুরঘাটে ধীরগতিতে নাট্যচর্চা হয়ে চলছে। ত্রিতীর্থের প্রাণপুরুষ হরিমাধব মুখোপাধ্যায় আজও নাটকের বাইরে অন্য কিছু ভাবেন না। তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে তরুণ অভিনেতাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছেন। শতাব্দী প্রাচীন বালুরঘাট নাট্যমন্দির বর্তমানে নতুন উদ্যমে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। 'সমবেত নাট্যকর্মী', অল্প দিন সৃষ্টি হলেও বেশ কতক গুলি নাটক উপহার দিয়েছে। বাইরের বেশ কিছু নাট্যদলকে এনে বালুরঘাটে নাটক করিয়েছে। নতুন অভিনেতা অভিনেত্রী তৈরী করা ছাড়াও পুরানো অভিনেতাদের এরা নাটকে সামিল করেছে। 'ভারতীয় গণনাট্যের শপথ শাখা' রাজনৈতিক আদর্শ নিয়ে কিছু নাটক পরিবেশন করেছে। 'সৃজন' নাট্যসংস্থা দক্ষিণ দিনাজপুরে অনুনাটক পরিবেশন করছে।

বর্তমানে নাট্য আন্দোলন কেবল কলকাতাতেই সীমাবদ্ধ নয়, শহরের গন্ডী অতিক্রম করে গ্রাম বাংলাতে জোয়ার এসেছে। অবিচলিত নিষ্ঠা, অদম্য উৎসাহ নিয়ে বাংলা নাটকের সামগ্রিক উন্নতিকল্পে নাট্য আন্দোলনের শরিক দল গুলো আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। হাজার বাধা বিপত্তিকে উপেক্ষা করে কলকাতা সহ মফঃস্বল এলাকার নাট্যদল গুলি এগিয়ে চলেছে। তবে নবীন প্রজন্ম অনেক পিছিয়ে। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের মধ্যে দিয়ে নাট্য আন্দোলনের বীজ রোপিত হয়েছিল তার অগ্রগতি মাঝপথে সিমিত হয়ে এলেও পরবর্তীতে অপেশাদার সংস্থাগুলির আত্মপ্রত্যয়, নিষ্ঠা এবং সর্বোপরি নাটকের মান উন্নত করার জন্য নাট্যকর্মীদের দায়িত্ব বোধে নবনাট্য আন্দোলন যথাযথ রূপ নিয়েছে।

সংস্কৃতির কেন্দ্র কলকাতা। কলকাতার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার সংস্কৃতি চর্চার তুলনা হয়না। কিছু মানুষের ধারণা কলকাতায় নিজেকে প্রসারিত করতে না পারলে হয়ত নিজেকে মূল্যায়ন করা যায় না। কলকাতার ছাপটি থাকা জুররী। কলকাতার বাইরে বলে যে কোন নাটক, উপন্যাস, গল্প, সাহিত্য নয় তা নয়। আসলে মফস্বলের কবিতা, নাটক, উপন্যাস আলাদা কিছু হতে পারে না। সার্থক শিল্পকে সকলে চিনে নেবেই। যেমন ত্রিতীর্থ প্রথম দিকে কলকাতার অভিনীত নাটক মঞ্চস্থ করলেও ত্রিতীর্থ কোনো ভাবেই কলকাতার ধারায় চলে না- তাই অচেনা ভাষাও (বাহে) কলকাতার লোক শিখে নেয়। এই সর্বত্রগামী হওয়াটাই শিল্পের বড় কথা। বালুরঘাটে নাটককার হরিমাধব মুখোপাধ্যায় শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটানোর চেষ্টা করেছেন এবং সফল হয়েছেন। তিনি গ্রাম্যজীবন, স্থানীয় সংস্কৃতি, নিয়ে নাটক লিখছেন ও প্রযোজনা করছেন। যদিও এটা সত্যি যে কলকাতা যে কোনো শিল্প টেকনোলজির দিক থেকে অনেক বেশী অগ্রগামী। কলকাতা কলকাতার মধ্যে থাকতে ভালোবাসে। তারা জানার চেষ্টা করে না কলকাতার বাইরে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য

মফঃস্বল এলাকার কোনো জনজীবনের কথা বা শিল্প সংস্কৃতির কথা। এই সময় নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে মফ:স্বল বাংলা বিশেষ করে বালুরঘাট আর কলকাতার মুখাপেক্ষী নয়। মঞ্চালংকার, শব্দ, সৃষ্টিতে আবহসংগীতে সমস্ত ক্ষেত্রে মফ:স্বল অঞ্চলে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে।

বালুরঘাট নাট্যমন্দির ছয়ের দশক পর্যন্ত গতানুগতিকতায় বিশ্বাসী ছিল। নতুন চেতনার বিকাশ ঘটালেন হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। তাঁর পূর্বে চেষ্টা করেছিলেন অবিনাশ দত্ত, কানাই দত্ত ও সত্যরঞ্জন তালুকদার 'ত্রিশূল' নাট্য সংস্থা সৃষ্টি করে। নাট্যমন্দিরে রাজনীতির বিস্তার ছিল, নাট্যমন্দিরকে করায়ত্ত করার চেষ্টা ছিল কিন্তু নাটক নির্বাচনেও প্রযোজনায় তার প্রভাব পড়ত না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যমন্দির গ্রুপথিয়েটারের ভূমিকা পালন করেছে। নাট্যমন্দির ভেঙ্গে 'ত্রিতীর্থ' (১৯৬৯) তৈরি হওয়ার পর নাট্যমন্দির থেকে 'নাট্যতীর্থ' (১৯৮২) তৈরি হয়েছে। আবার ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থা থেকে কয়েকজন প্রতিভাধর অভিনেতা বেড়িয়ে গিয়ে অন্য সংস্থায় মিশে গেছে, কালের নিয়মে নাট্যমন্দির বহুবার ভেঙ্গেছে। রাজধানী কলকাতার দিকেও লক্ষ করলে দেখা যায় বিভিন্ন নাট্য সংস্থা একাধিক বার ভেঙ্গেছে। সামগ্রিক ভাবে গ্রুপ থিয়েটার গুলির মধ্যেও যেন এক অস্থিরতা। এক সংগঠন থাকতে আর একটা সংগঠন হচ্ছে। প্রযোজনা গুলো কখনও ভালো হচ্ছে আবার কখনো ঝিমিয়ে পড়ছে। একদল অন্যদলের শিল্পীদের নিয়ে নাটক করতে পারছে না। প্রকৃত পক্ষে একদা যাঁরা 'পার্টির শাসন মানব না, স্বাধীনভাবে শিল্প করব' বলে গণনাট্য ত্যাগ করেছিলেন, সেই সমস্ত স্বাধীন হতে চাওয়া ব্যক্তিগণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাবমূর্তি নিয়ে এক একটি দল গড়ে ছিলেন। সেই ব্যক্তিরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সংজ্ঞ ত্যাগ করে তো স্বাধীন হলেন কিন্তু তাঁদের অধীনে থাকলেন অন্যান্য শিল্পীরা। কালক্রমে এই অধীনস্থ শিল্পীরাও স্বাধীন হতে চাইলেন, ফলে দল ত্যাগ করলেন, নতুনদল গড়লেন, পুরনো দল ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হল। এই প্রক্রিয়া বালুরঘাটের নাট্যজগতেও বহমান। তবে এই ভাঙ্গন প্রক্রিয়া বালুরঘাটের নাট্যজগতের পক্ষে কল্যানকর হয়েছে। বালুরঘাটের নাট্যসংস্থাগুলিতে দেখা যায় নাটক পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিচালক নাটক পরিচালনা করে থাকেন কিন্তু ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থাতে কেবল মাত্র পরিচালক হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ই নাটক পরিচালনা করছেন।

সমাজজীবন রাজনীতি এবং সমাজনীতির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না। রাজনীতি এবং সমাজনীতির দ্বারাই নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে আমাদের সমাজজীবন এবং এই সমাজ জীবনকে কখনই অবহেলা করতে পারে না আমাদের নাটক ও নাট্যশালা। জাতির এবং সমাজের সুখ-দু:খ, আশা-আকাঙ্খা, আনন্দও স্বপ্ন যদি নাটক ও নাট্যশালায় প্রতিফলিত না হয়, তবে সে নাটক ও নাট্যশালা লক্ষভ্রষ্ট।

মফ:স্বল এলাকার প্রযোজিত নাটক গুলি বিচিত্র প্রকৃতির। কেউ নাটকের মধ্যে সমাজ জীবনের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা বলতে চেয়েছেন। কেউ বা রোমান্টিক পরিমন্ডলের মধ্যে যন্ত্রণার পরিসমাপ্তি খুঁজছেন, কেউ বা বর্তমান যুগের হৃদয়হীন যান্ত্রিকতার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত মানুষের কথা তুলে ধরতে চাইছেন। কেউ বা তুলে ধরতে চেয়েছেন মানুষের অস্তিত্বের সংকট ও মূল্যবোধের অবক্ষয়। প্রত্যেক নাট্য দলের ইচ্ছে এবং চেষ্টা এক না হলেও লক্ষ্য একটাই- তা হল নাটকের সামগ্রিক মানোন্নয়ন। বাংলা নাটক ও নাট্যশালা চিরদিনই জাতির প্রয়োজনে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে ক্রম অগ্রগতির পথে অপেশাদার নাট্য সংস্থা সমূহের সামান্যতম দানও যদি স্বীকৃত হয় তবে দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটের নাট্য সংস্থা গুলিও তার অংশীদার।

থিয়েটার পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও মানতে হবে থিয়েটারই সামাজিক সিস্টেমের একটি বিকল্প স্তর বজায় রাখে, যার জন্য থিয়েটার ওয়ালারা সবসময়ই বিপজ্জনক। কোনও জাতির শারীরিক স্বাস্থ্যের মান বুঝতে গেলে যে ফুটবলে কতটা পারঙ্গম তা যেমন একটা সূচক, তেমনই কোনও জাতির মানসিক স্বাস্থ্য কেমন তা বোঝার অব্যর্থ টোটকা হল তার থিয়েটার কেমন হচ্ছে তা দেখা। থিয়েটার সেই জাতির বুদ্ধি মেধা ও আবেগের একটা মোট যোগফলকে সামনে নিয়ে আসে। এবং যা একান্তই সাধনা ও চর্চার বিষয়।

আমার গবেষণার বিষয় **''বালুরঘাটের শতাব্দী প্রাচীন নাট্যচর্চার সেকাল-একাল''**। সময় ১৯০৯-২০০৮। গবেষণা পর্বের সমাপ্তিতে যে বিষয় গুলি উঠে এসেছে তা নিম্নরূপ-

১. বালুরঘাট সীমান্ত এলাকার একটি ছোট গ্রাম্য শহর। এক বিশেষ স্বাতন্ত্র নিয়ে এখানকার নিজস্ব সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। আয়তনে ও জনসংখ্যায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ক্ষুদ্রতম জেলা, অর্থনৈতিক দিক থেকেও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে দরিদ্রতম জেলা। শিল্পবিহীন এই জেলা পরিপূর্ণ ভাবে কৃষিনির্ভর, অথচ সেচ ব্যবস্থার অভাবে কৃষির উন্নতিও প্রত্যাশিত মাত্রার নিচে। অবহেলিত, বঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া এই জেলার অতীত ইতিহাস বহন করে চলেছে অতীত ভারতের ইতিহাসের গৌরব ও খ্যাতির পরিচয়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সংক্রিয় অংশগ্রহণকারী বালুরঘাট তথা দক্ষিণ দিনাজপুরের সঠিক মূল্যায়ন হয়নি।

২. উনিশ শতকের শেষ দশক থেকেই বালুরঘাটের নাট্যচর্চার সংবাদ পাওয়া যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে তা প্রতিষ্ঠা পায় এবং আজ একশো বছর অতিক্রম করে গেছে বালুরঘাটের নাট্যচর্চা সাফল্যের সঙ্গে।

৩. মন্মথ রায় (টুকু) নাটককার মন্মথ রায় হওয়ার কারণ বালুরঘাট। নাটককার মন্মথ রায়ের ধাত্রী বালুরঘাট নাট্যমন্দির।

৪. পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে 'ত্রিতীর্থ' (১৯৬৯) নাট্যসংস্থা প্রথম বের্টোল্ট ব্রেখট এর 'দ্য লাইফ অব গ্যালিলেও' এর অনুবাদ-'গ্যালিলেও' বাংলা রঙ্গমঞ্চে মঞ্চায়িত করে। গ্রুপ থিয়েটারের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

৫. পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে 'ত্রিতীর্থ'(১৯৬৯) নাট্য সংস্থা প্রথম হাইনরিখ ক্লাইস্টের নাটক মঞ্চস্থ করে ('ব্রোকেন জাগ'> 'ভাঙ্গাপট')।

৬. নাটককারেরা ও অভিনেতারা বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী হলেও বালুরঘাটের কোনো সংস্থার নাটক প্রযোজনায় রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রকাশ দেখা যায় না। কেবল মাত্র গণনাট্যের দুটি শাখা রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রকাশ করে থাকে। বালুরঘাটের নাট্যসংস্থাগুলি সম্পূর্ণ রূপে গ্রুপথিয়েটারের ভূমিকা পালন করছে।

৭. বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে বালুরঘাটের নাটককারেরাও উল্লেখযোগ্য।

৮. পশ্চিমবঙ্গের নাট্যাভিনেতাদের তালিকায় দক্ষিণ দিনাজপুরের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের স্থান হতে পারে।

৯.রাইনূপুর মিত্র বঙ্গরঙ্গ মঞ্চের ইতিহাসে প্রথম শিশু অভিনেত্রী যিনিএকক অভিনয় করেছেন।

১০. সমগ্র ভারতবর্ষের নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ স্থানের সঙ্গে বালুরঘাটও স্থান পাওয়ার যোগ্য।

১১. উত্তরবঙ্গে প্রথম অনুনাটক মঞ্চস্থ করে ‘বালুরঘাট সৃজন নাট্য সংস্থা’।